গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৯ - ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে মিছিল ও আইনঅমান্য

পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম, গণপরিবহণের ভাড়া, বিদ্যুৎ মাশুল কমানো, ছাঁটাই বন্ধ, পিটিটিআই সমস্যার সমাধান, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরত, লালগড় ও অন্যত্র আদিবাসী জনগণের ন্যায্য দাবির মীমাংসা, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি, সারের কালোবাজারি বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির ডাকে ৪০ হাজার মানুষের বিশাল মিছিল ও গণ আইন অমান্য।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তীব্র ঘৃণার প্রকাশ

১৫ ডিসেম্বর বাগদাদে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দিকে পায়ের জুতো ছুঁড়ে সাংবাদিক মুনতাজর আল জায়দি আরবি ভাষায় চিৎকার করে বলেন, ''কুত্তা, এই নে তোর বিদায় চুম্বন ...। এটা ইরাকের বিধবা, অনাথ ও খুন হওয়া মানুষের তরফ থেকে...।''

মানবাধিকার দিবসে পুলিশকর্তার মুখে আন্দোলনকারীদের চরম ক্ষতি করার নির্দেশ

১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা দিবসে রাজ্য ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সভায় রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুপভূষণ ভোরা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন লাঠি ও গুলি চালানোর জন্য। বলেছেন, 'নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যখন লাঠিচার্জ করা উচিত মনে হয় করুন এবং করার সময় মনে রাখুন যে, হাড়টা ভাঙতে হবে।' আরও বলেছেন, 'গুলি চালানোর দরকার থাকলে চালান এবং এমনভাবে চালান, যাতে অপরাধীর চূড়ান্ত ক্ষতি হয়' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১-১২-০৮)। কী ভয়ঙ্কর নির্দেশ! যে কোনও পুলিশকর্মী ইচ্ছা হলেই লাঠি চালাবেন এবং এমনভাবে চালাবেন যাতে হাড় ভাঙে? লাঠি চার্জের উদ্দেশ্য ছিল, জমায়েত হওয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা। পরিবর্তে পুলিশকর্তা অর্ডার দিচ্ছেন, মানুষকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই লাঠি চালাও! গুলি চালানোর ক্ষেত্রেও কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বনের বিধি আছে। গুলি চালানোর আগে জনতাকে সতর্ক করতে হবে, একান্ত বাধ্য হলেই গুলি চালাবে — তাও জনতার হাঁটুর নিচে। সেইসব বিধিনিষেধ কি উঠে গেছে? আইন-আদালত কী বলে? গুলি চালানো হবে চূড়ান্ত ক্ষতি, অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্যে? আর অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিনা, তার বিচার কে করবে? পুলিশ? তাহলে আদালত আছে কেন? এই কি গণতন্ত্র, মানবাধিকার?

মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশকে যখন আরও বেশি সজাগ হতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখনই পুলিশ দপ্তরের বড়কর্তা চড়া সুরে সরব হয়েছেন জনতার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে। সত্যিই যদি মুখ্যমন্ত্রী মানবাধিকার রক্ষায় আন্তরিক হন তাহলে শুধু সভায় বক্তৃতা দিয়ে নয়, মানবাধিকার রক্ষার্থে ডি জি-র কাছে এ কথার জন্য কৈফিয়ত তলব করুন, তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলুন। কিন্তু

দুয়ের পাতায় দেখুন

চটকল ধর্মঘট অব্যাহত, প্রত্যয়ে দৃঢ় শ্রমিকরা

১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ৫৯টি চটকলের আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সিটু বাদে ১৭টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। চটকল মালিকদের সংগঠন 'ইজমা'র প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় কাজোরিয়া দম্ভ ভরে বলেছিলেন 'বড়জোর এই ধর্মঘট ৪ দিন চলবে। ভেবেছিলেন, ভেতর থেকে সিপিএম নেতৃত্ব আন্দোলনকারীদের মনোবল ভেঙে দিয়ে, বাইরে থেকে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে, টাকার থলি ব্যবহার করে দালাল তৈরি করে ধর্মঘট ভেঙে দিতে পারবে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা ধর্মঘট ভেঙে দিতে পারেনি। শ্রমিকরা তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। ১৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, ধর্মঘট এখনও চলছে। ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে মালিকরা অবশেষে 'ধর্মঘট ব্যর্থ' বলে প্রচারের কৌশল নিয়েছে।

এই ধর্মঘটের আসল শক্তি কোথায় নিহিত, অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও কেন শ্রমিকরা এই ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর? কী তাদের দাবি? হেস্টিংস জুটমিলের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইদ্রিশ বললেন, মালিকদের কাছে আমরা কোনও নতুন দাবি করিনি। যে অধিকারগুলি আমাদের ছিল মালিকরা সেগুলি হরণ করছে। এই ধর্মঘট সেই অধিকার রক্ষারই ধর্মঘট। ২০০৭ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী মাসিক ৫২৫ পয়েন্ট ডিএ মালিকদের দেওয়ার কথা। কিন্তু মালিকরা দিচ্ছে না। দেখতে দেখতে ১৮ মাস হয়ে গেল। আমরা কেন্দ্রীয় নেতাদের জানালাম, একটা কর্মসূচি নিন। তা না হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে বাঁচব কী করে?'

এই ধর্মঘটের দাবি যে নিচু তলা থেকেই উঠেছে, বুর্জোয়াদের প্রচার মাফিক শ্রমিকদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনও ধর্মঘট নয়, শ্রমিকদের কথাতেই তা পরিষ্কার। তাই এই ধর্মঘট সফল করতে সাধারণ শ্রমিকরাই সক্রিয়; তারা মালিকদের ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

'ইজমা'র প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় কাজোরিয়ার হেস্টিংস জুট মিলে তালা

শহীদ বিরসা মুন্ডা স্মরণ অনুষ্ঠান

ছোটনাগপুরের মুন্ডা বিদ্রোহ উলগুলান (১৮৯৯-১৯০০ খ্রিঃ)-এর অবিসংবাদী নেতা শহীদ বিরসা মুন্ডার জন্মদিন ১৫ নভেম্বর ১৮৭৫। এই মহান বিদ্রোহী নেতার ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আদিবাসী সংযুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে ২২ নভেম্বর কলকাতার থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতেই বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রধান অতিথি অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এবং সভাপতি সুখচাঁদ কিস্কু বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। শহীদ বিরসা মুণ্ডার জীবনসংগ্রাম এবং বর্তমানে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর। সভায় লালগড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। প্রস্তাব উত্থাপন করেন আদিবাসী সংযুক্ত মঞ্চের কোষাধ্যক্ষ বিসম্বর মুড়া এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বসুরাম সিং সর্দার, ১৫০তম হুল বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক পরিমল হাঁসদা, ২৪ পরগণা আদিবাসী জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি কালিপদ সর্দার, সান্তাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেকরঞ্জন বেসরা প্রমুখ।

বিড়ি শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে এক শক্তিশালী দুষ্টচক্র

বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও কল্যাণ প্রকল্পকে ঘিরে শাসকদলের রাজনৈতিক মদতে এবং বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সহায়তায় এ রাজ্যে এক ভয়াবহ দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। এলাকায় এলাকায় দালাল ও দুষ্টচক্রের বলি হচ্ছে যথার্থ বিড়ি শ্রমিক এবং তাদের ন্যায়সংগত স্বার্থ। হাজার হাজার পরিচয়পত্র বিলি করা হয়েছে অশ্রমিকদের হাতে। বিড়ি শ্রমিকদের প্রাপ্য বাড়ি তৈরি করার কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে দালাল ও বিড়ি শ্রমিক নয়, এমন একদল রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ব্যক্তি। এই চক্রের মাধ্যমেই বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকা ব্যয়িত হচ্ছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী স্বার্থে এবং কায়েমী স্বার্থের অনুগত কর্মীবাহিনী তৈরির কাজে। এই কারণেই পরিচয়পত্র দেওয়ার অধিকার সহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প নিজেদের হাতে রাখার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। এমনই অভিযোগ তুলেছেন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বিড়ি শ্রমিক অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। ৪ ডিসেম্বর কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিকের এক প্রতিবাদী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, যে সিপিএম সরকার সারা দেশে একই মজুরি নির্ধারণের দাবি করে থাকে— তারাই এই রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য চার রকমের মজুরি হার নির্ধারণ করেছে। বাস্তবে নির্ধারিত মজুরির অর্ধেকও পান না বিড়ি শ্রমিকরা। ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে না। বরং তারা মালিকদের আইন লঙ্ঘনেই উৎসাহ দিয়ে থাকে। প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ বিভিন্ন আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা একই। সিপিএমের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করে চলেছে এ আই ইউ টি ইউ সি।

ডিজির কণ্ঠে শাসকদলেরই সুর

একের পাতার পর

এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অনেকের স্মরণে থাকার কথা, কিছুকাল আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্মীদের এক সভায় প্রায় বর্তমান ডিজি'র ঢঙেই বলেছিলেন, 'গুলি চালান, ও সব মানবাধিকার-টাধিকার আমি দেখে নেব।' সেটাই মনে হয় রাজ্য পুলিশকর্তাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

বর্তমানে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ সীমাহীন। বছরভর অসাধু ও বেআইনি কাজকর্ম করার পাশাপাশি অবৈধভাবে, জবরদস্তি অর্থ আদায় সহ অসংখ্য দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে পুলিশকর্মীরা। যে কোনও ছোটখাট অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে শুরু করে বেআইনি মদের ঠেক, ডাকাতি,খুন,ধর্ষণ, অপহরণ, নারী-শিশু পাচার সমস্ত কিছুর সাথেই জড়িত থাকে তারা। নিজেদের হাজারো ব্যর্থতা ঢাকতে এবং অপকর্ম হাসিল করতে সরকারের প্রয়োজন হয় এদের। পরিবর্তে তারাও যথেচ্ছাচার করার ছাড়পত্র পায় সরকারের কাছ থেকে।

জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ-আন্দোলন দমনের জন্য যথেচ্ছ লাঠি, গুলি চালানোর ছাড়পত্র বহুদিন পূর্বেই পুলিশ পেয়েছে। বাস্তবে সিপিএম নেতা মন্ত্রীদের মনের কথাই পুলিশ কর্তার প্ররোচনামূলক উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সিঙ্গুরে,নন্দীগ্রামে পুলিশি অত্যাচারের বীভৎসতায় দেশের মানুষ যখন শিউরে উঠেছেন, তখনও পুলিশকর্মীদের বাহবা দিয়েছেন সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। নন্দীগ্রামে গুলি চালানোর পরে গোটা বিশ্ব যখন নিন্দায় সরব, তখন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন,'পুলিশ গুলি চালাবে না তো কী করবে? ফুল ছুঁড়বে, না রসগোল্লা ছুঁড়বে?' নিজেদের দলীয় স্বার্থরক্ষায় পুলিশের নৃশংস অপারেশনে উল্লসিত সিপিএম নেতা বলেছেন, 'নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় হয়েছে।' লালগড়ে আদিবাসী জনগণের উপর ধারবাহিক পুলিশি অত্যাচারের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা।

আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যত সংকটগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই সংকটের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে সরকারি দলগুলি জনগণ থেকে যত বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততই পুলিশ-প্রশাসনের উপর তাদের নির্ভরতা বাড়ছে। সেজন্যই পুলিশকর্তাদের পক্ষে এখন প্রকাশ্যে সভায় দাঁড়িয়ে জনগণের হাড় ভেঙে দেওয়ার, গুলি করে হত্যা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে আটকাচ্ছে না। এই পশ্চিমবঙ্গেই অতীতে কংগ্রেস শাসনে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের বর্বর পুলিশি অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। আজকের অনেক নেতাই সেদিন তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। আজ তাদেরই দেখা যাচ্ছে অতীতের কংগ্রেস শাসকদের ভূমিকায়।

মোটরভ্যান চালকদের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের বৈধ লাইসেন্স ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দ্বিতীয় দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুজিত ভট্টশালী, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি গৌতম ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক জয় লোধ। গণেশ রায়কে সভাপতি, জয় লোধকে সম্পাদক এবং মহম্মদ রাজীবকে কোষাধ্যক্ষ করে ২০ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

ওড়িশার বিশিষ্ট পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

ওড়িশার অনগুল জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড ভীমসেন বেহেরা গত ২৪ নভেম্বর কলকাতার হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। গত চার বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। কটকের আচার্য হরিহর ক্যান্সার হাসপাতাল, মুম্বইয়ের যশলোক হাসপাতাল ও সর্বশেষে কলকাতায় তার চিকিৎসা হয়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত কমরেড তাপস দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার মধ্য দিয়ে কমরেড ভীমসেন বেহেরা ১৯৮০ সালে ওড়িশার ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। এরপরই অনগুল জেলায় এস ইউ সি আই ও তার গণসংগঠনগুলি গড়ে তোলার সংগ্রামে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা, যুব ও শিক্ষকদের নানা ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কমরেড বেহেরা অনগুল জেলায় একজন জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন মূল্যবান সংগঠক ও দৃঢ়চেতা বিপ্লবীকে হারাল যিনি নিজের সমগ্র জীবনকে বিপ্লব সাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন।

কমরেড বেহেরার শেষকৃত্য ২৫ নভেম্বর অনগুলে সম্পন্ন করা হয়। ৩০ নভেম্বর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভিখারি প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস। এ ছাড়াও কমরেডস্ বিষ্ণু দাস, রঘুনাথ দাস, শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ রাজ্যস্তরের নেতা ও অন্যান্য জেলা নেতারা প্রয়াত কমরেডের সংগ্রামী জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড ভীমসেন বেহেরা লাল সেলাম

সারের কালোবাজারি ঃ জেলায় জেলায় আন্দোলন

সারের কালোবাজারি প্রতিরোধ করে সরকারি দামে সার পাওয়ার দাবিতে গত তিনমাস ধরে বিভিন্ন জেলায় কে কে এম এসের নেতৃত্বে ধর্না, পথ অবরোধ, এডিও ডেপুটেশন, জেলাশাসকের কাছে দাবি সনদ পেশ ইত্যাদি কর্মসূচি চলছে জেলায় জেলায়। আন্দোলনের চাপে কিছু কিছু জায়গায় ডিলাররা সরকারি দামে সার বিক্রি করতে বাধ্য হলেও সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। সামনেই বোরো চাষের মরসুম। সারের অত্যধিক প্রয়োজনে আরও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবাধে চলছে কালোবাজারি। এই কাজে ডিলার, স্টকিস্ট, আমলা, শাসক রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্টচক্র অত্যন্ত সক্রিয়। এ আই কে কে এম এস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ৪ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী এ ডি ও ঘেরাও করা হয়। কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন এ ডি ও অফিস দীর্ঘসময় ধরে ঘেরাও করে রাখে হাজার হাজার কৃষক। বিভিন্ন এ ডি ও অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আসতে বাধ্য করা হয়। কোথাও এ ডি ও লিখিতভাবে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন কৃষকদের মনে গভীর আস্থার সৃষ্টি করেছে। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান।

কলকাতায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্না

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের রাজ্য শাখার ডাকে ২৮ নভেম্বর ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্না কর্মসূচি পালিত হল আই বি এ কলকাতা লোকাল চ্যাপ্টার, এন এস রোড, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক-এর হেড অফিসের সামনে। অবিলম্বে বেতন সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, সরকারি নোটিফিকেশন মেনে সমস্ত পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করতে হবে, স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে গ্রাহক পরিষেবাকে উন্নত করতে হবে, বিশাল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ইচ্ছুক সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে বর্তমান পেনশন স্কিমে আসার সুযোগ দিতে হবে, ক্যাজুয়াল কর্মী, ক্যান্টিন কর্মী এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের ব্যাঙ্কে পূর্ণ সময়ের নিয়মিত কর্মীতে রূপান্তরিত করতে হবে, আউটসোর্সিং, মার্জার এবং বেসরকারীকরণ চলবে না — এই দাবিগুলির ভিত্তিতে দুই শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী এই ধর্নায় অংশ নেন। ধর্না থেকে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আই বি এ লোকাল চ্যাপ্টারের প্রধান, তথা এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক-এর চেয়ারম্যান-এর প্রতিনিধির কাছে ডেপুটেশন দেয়।

ধর্নামঞ্চে জগন্নাথ রায়মণ্ডল ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস, সংগঠনের ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র বেহেরা, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক শান্তি ঘোষ, সভাপতি বঙ্কিম বেরা, মেহবুব আহমেদ, কে জি সাহা, চণ্ডী ব্যানার্জী, সুশান্ত পাত্র, আলোকতীর্থ মণ্ডল, মহেন্দ্রনাথ সিং, শ্রীরূপ দাস, অরূপ সাহা, শোভা বল প্রমুখ।

বক্তারা প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন যে, বিশ্বায়নের নীতির ফলেই আজ বহুবিধ আক্রমণ নেমে আসছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির সঞ্চালক রাজনৈতিক দলগুলি বহু ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নীতি রূপায়ণে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত বলেই তাদের পক্ষে এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

খড়্গপুরে পরিচারিকাদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির খড়্গপুর শাখার পক্ষ থেকে ৮ ডিসেম্বর মহকুমাশাসকের কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নিম্ন আয়ের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে বি পি এল রেশন কার্ড দিতে হবে, অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় মদের ঠেকগুলি উচ্ছেদ করতে হবে এবং পরিচারিকাদের স্বাক্ষর করে তোলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রভৃতি দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সুনীতা গুপ্ত, জয়শ্রী চক্রবর্তী, মালা পালিত, কৃষ্ণা সাঁতরা, মণি হাজরা, পারুল সিং, নিয়তি সাউ প্রমুখ।

মন্দার দোহাই দিয়ে লুটেরা মালিকশ্রেণীকে লক্ষ কোটি টাকা ভেট দিচ্ছে সরকার

ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য কয়েক দফায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা ঢালার পর আবার অতি সম্প্রতি ৩০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে পরিকাঠামো, শিল্প এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা খাতে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। সব ধরনের পণ্যের উপর কেন্দ্রীয় যুক্তমূল্য কর (সেনভ্যাট) ৪ শতাংশ কমানো হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৮,৭০০ কোটি টাকা। রপ্তানি ক্ষেত্রে করছাড় ও ভরতুকি বাবদ সরকার ব্যয় করবে ২ হাজার কোটি টাকা।

এ ছাড়াও সরকার পরিকাঠামো খাতে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' ভিত্তিতে খরচ করবে ১ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে দশ হাজার কোটি টাকা করমুক্ত বন্ডের মাধ্যমে বাজার থেকে ঋণ হিসাবে তোলা হবে। এই ধরনের যৌথ উদ্যোগে ২৮,৩০৩ কোটি টাকার ২১টি হাইওয়ে প্রোজেক্টের অনুমোদন ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন পরিকাঠামো, রেলওয়ে সেক্টর প্রভৃতি নানা ধরনের প্রোজেক্টে এই টাকা ব্যয় করা হবে। সব মিলিয়ে আগামী মার্চ পর্যন্ত সরকার নানা খাতে ৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে বলে ঘোষণা করেছে।

এক কথায় সরকার শিল্পপতিদের জন্য রাজকোষ একেবারে উজাড় করে দিচ্ছে। অর্থনীতিতে এই বিপুল ভরতুকির ফল কী? দেশজুড়ে যে ছাঁটাইয়ের বন্যা আসছে তা কি আটকানো যাবে? এর দ্বারা নতুন কর্মসংস্থানের রাস্তা খুলবে কি? মালিকদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার সময়ে সরকার কি তাদের ওপর এই শর্ত চাপিয়েছে যে, কোনও রকম লে-অফ বা ছাঁটাই করা চলবে না বা নতুন নিয়োগ করতে হবে? না, এমন কোনও শর্তের কথা সরকার মালিকদের বলেনি। বরং প্যাকেজ ঘোষণার পরে পরেই বণিকসভা সিআইআই এবং ফিকি-ও জানিয়ে দিয়েছে, ছাঁটাই বন্ধ হবে না। বস্ত্র, ধাতু, যন্ত্রাংশ, চর্ম, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি উৎপাদন শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগামী ৪-৫ মাসে উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসবে এবং কর্মী সংখ্যাও কমবে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, মন্দার অজুহাতে সরকারের উপর চাপ দিয়ে তারা এখনই তাদের জন্য আরও ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দাবি করেছে।

সব ধরনের পণ্যে ৪ শতাংশ সেনভ্যাট কমানোর কথা যে সরকার ঘোষণা করেছে, তার সুবিধা কি জনগণ পাবে? তথ্য বলছে, তা পাবে না। যেমন, সিমেন্টের ক্ষেত্রে বাস্তবে দু'-একটি ছোট কোম্পানি ছাড়া নানা অজুহাত দেখিয়ে বেশিরভাগ বড় কোম্পানিই দাম কমাতে রাজি হয়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও এর ফল মালিকরাই আত্মসাৎ করছে, সাধারণ মানুষ প্রায় কিছুই পায়নি। খাদ্যদ্রব্যের দামও কিছুমাত্র কমেনি। তা হলে জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় সরকারের এই প্যাকেজে দেশের জনগণের কী সুরাহা হল?

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ৭০ শতাংশ কমা সত্ত্বেও সরকার দেশের বাজারে পেট্রোলের দাম কমিয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ, ডিজেলের দাম কমিয়েছে আরও কম; মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের ব্যবহার্য গ্যাসের দাম বা গরিব মানুষের ব্যবহার্য কেরোসিন তেলের দাম সরকার এতটুকুও কমায়নি। পরিবহণের ভাড়া না কমায় স্বাভাবিকভাবেই তেলের দাম কমানোর যতটুকু সুফল, তা ভোগ করছে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত এবং পুঁজিপতিরাই। সরকার নানা নামে বিপুল পরিমাণ ভরতুকি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে, অথচ ডিজেলের দাম আরও অনেকখানি কমিয়ে অনায়াসে পণ্য পরিবহণ এবং গণপরিবহণের খরচ কমিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে যে সাশ্রয় আনা যেত, তার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। এ থেকেই কি স্পষ্ট হয়ে যায় না যে, জনস্বার্থকে বলি দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর লুটের স্বার্থ দেখাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই সরকার জনসাধারণের নয়, মালিক সরকার।

সরকারি নেতা-মন্ত্রী এবং মালিকদের অনুগ্রহপুষ্ট অর্থনীতিবিদরা প্রচার করছেন যে, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটই দেশজুড়ে মন্দার কারণ। অথচ বাস্তবে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই মন্দার পরিস্থিতি চলছিল, কমছিল শিল্প বিকাশের হার। আন্তর্জাতিক সংকট এই মন্দাকে আরও তীব্র করেছে মাত্র। অভ্যন্তরীণ বাজারে অতিউৎপাদনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল, উৎপাদন সংস্থাগুলি উৎপাদনে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছিল না। বাড়ছিল লে-অফ, লক-আউট-ছাঁটাইয়ের সংখ্যা। কারণ দেশের অভ্যন্তরেও পুঁজিপতিশ্রেণীর সীমাহীন শোষণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। গোডাউনে মাল ভর্তি হয়ে থাকলেও ক্রেতার অভাবে তা পড়ে থাকছে। গাড়ি-সিমেন্ট-ইস্পাত বা সাধারণ ভোগ্যপণ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। ২০০৭-'০৮ সালের জন্য গত মে মাসে (অর্থাৎ বর্তমান মহামন্দার পরিবেশের আগেই) প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্যেই প্রমাণ ছিল ভারতেও শিল্প-কৃষি উৎপাদন নিম্নমুখী, বিশেষত উৎপাদন শিল্পে বিকাশের হার শোচনীয়ভাবে কম। বিশ্বায়ন, উন্নয়ন, বিকাশ প্রভৃতি রঙিন কথা দিয়ে বাস্তব এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিটাকেই সরকার আড়াল করে রেখেছিল, যা আজ প্রকাশ্যে এসে গেছে। দেশের মানুষের যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকার বিশেষ কিছুই করেনি। আজও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল, তা না নিয়ে জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা সরকার নিয়েছে। সরকারের বক্তব্য, রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বা পরিকাঠামো খাতে ব্যয় জনসাধারণের হাতে বাড়তি টাকার জোগান দেবে, যা বাজারকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করবে। এ তো নতুন কিছু নয়, এ হচ্ছে কৃত্রিমভাবে কিছু চাহিদা সৃষ্টি করে মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদী বাজারকে সাময়িকভাবে হলেও তেজি করার পুরানো কেইনসীয় ফরমুলা। বর্তমানে আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের পুঁজিবাদী শাসকরাই এই কেইনসীয় ফরমুলায় অর্থনীতিকে তেজি করার রাস্তা নিয়েছে, সেই জন্য সরকারি কোষাগার খুলে দিচ্ছে। যদিও এই কেইনসীয় ফরমুলাও ১৯২৯ সালে মহামন্দার হাত থেকে মার্কিন অর্থনীতিকে বাঁচাতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরকার পড়েছিল।

ভারতে তো স্বাধীনতার পর থেকে পুঁজিবাদী শাসক দলগুলো এই কেইনসীয় ফরমুলাতেই অভ্যন্তরীণ বাজার তেজি রাখার চেষ্টা করেছে নানা উপায়ে। কিন্তু এ দেশেও সেই নীতি শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিকে মন্দা বা সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই নয়ের দশকের গোড়ায় এসে ঘোষণা করা হল, উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের পথে মুক্ত বাজার ব্যবস্থাই পারে ভারতকে অগ্রগতির শিখরে পৌঁছে দিতে। শুরু হল বি-রাষ্ট্রীয়করণ তথা বেসরকারীকরণ, খনি, ইস্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দামে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। আজ যেমন সরকার বলছে, শিল্পপতিদের দেওয়া এই বিপুল সুবিধা চুঁইয়ে এসে সাধারণ মানুষের ঝোলাতেও পড়বে, সেদিনও নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং জনতার উদ্দেশে বলেছিলেন, ধৈর্য ধরুন, পাঁচ বছরের মধ্যে এর সুফল আপনারা পাবেন। পাঁচ বছর পরেও যখন জনতা সেই সুফল পেল না, তখন তিনি বললেন, দশ বছরের মধ্যে নিশ্চয় মিলবে। আজ আবার বলছেন, বিশ্বায়নের নীতিতে যে সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি, তা এখন 'মালিকদের জন্য ঢালাও প্যাকেজ' নীতিতে ঠিক পৌঁছাবে।

রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বা পরিকাঠামো খাতে ব্যয় যদি সত্যি জনসাধারণের হাতে বাড়তি টাকার জোগান দিয়ে বাজারকে চাঙ্গা করতে পারত, তবে সরকারকে আজ এই সংকটে পড়তে হত না, কারণ তারা দীর্ঘকাল এই নীতি নিয়ে চলেছে। প্রথমত, এর দ্বারা সমাজের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের হাতেই কিছু টাকা আসবে, বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এর আওতার বাইরেই থেকে যাবে। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি আজ দেশের অন্যতম একটি গুরুতর সমস্যা। যত দিন যাচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এই সমস্যা সমাজে ব্যাপক আকার নিচ্ছে। সংসদীয় দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে, আর তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করছে। ফলে সরকারি পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ন হলে বরাদ্দ অর্থ জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশের কাছে হলেও যতটুকুও এই অর্থ পৌঁছাত তাও আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতীতেও দেখা গেছে, পরিকাঠামো নির্মাণে যৌথ উদ্যোগের নামে সরকার জনসাধারণের ট্যাক্সের যে টাকা মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তার সিংহভাগই চলে যায় এই সমস্ত মালিকদের পকেটে। এই দুর্নীতি আটকানোর কোনও ক্ষমতা আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এই রাষ্ট্রের নেই। ন্যাশনাল হাইওয়েগুলি নির্মাণের সময়ে এই আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েও পাননি প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে। শেষ পর্যন্ত মালিকদের ভাড়াটে খুনিদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে।

একদিকে যখন সরকার জনসাধারণের হাতে বাড়তি টাকার জোগানের কথা বলছে, তখন এই প্রশ্নের জবাব তো অত্যন্ত জরুরি যে, রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা এই যে সরকার মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে, এর ফল কী হবে? আগামী বছরে বিপুল রাজকোষ ঘাটতির কথা সরকার নিজেই স্বীকার করছে। অথচ এই সরকারই একদিন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহণ প্রভৃতি পরিষেবা খাতে এর ভগ্নাংশ পরিমাণ যে টাকা বরাদ্দ ছিল, রাজকোষ ঘাটতির অজুহাত তুলে তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আজ কিন্তু সরকার রাজকোষ ঘাটতির কথা একবারও ভাবছে না। নানা রকম কর ছাড় ছাড়াও মালিকদের নামমাত্র সুদে যে বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া হচ্ছে, কত জন তা শোধ করবে? রেকর্ড বলছে ব্যাঙ্কের প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা শিল্পপতিরা বিভিন্ন সময়ে ঋণ হিসাবে নিয়ে আজও শোধ দেয়নি। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে? মন্দা এড়ানোর নামে আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে না? ইতিমধ্যেই সরকারি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমছে। এরপর এই বিপুল ভেট দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ঘাটতি সরকার মেটাবে কী করে? হয় তাকে বাজেটে বিপুল ট্যাক্স চাপাতে হবে, না হয় টাকা ছাপিয়ে এই ঘাটতি মেটাতে হবে, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেবে। সরকার কোনওভাবেই পুঁজিপতিদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাবে না, তা চাপাবে জনগণের উপর। কারণ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ছাড় দেওয়াই সরকারের উদার আর্থিক নীতির অন্যতম শর্ত। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন কমায় কোম্পানি কর এবং ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ আয়ও কমবে। ফলে আর একটি রাস্তাই সরকারের কাছে খোলা আছে। তা হল, মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সমস্ত জনকল্যাণ খাতে ব্যয়বরাদ্দ আরও হ্রাস করা। কিন্তু এই নীতি কি পরিণতিতে বাজারকে আরও সংকুচিত করবে না? তার ফল তো আরও মন্দা, আরও ছাঁটাই। অর্থাৎ মালিকদের জন্য দেওয়া এই বিপুল ভরতুকির সমস্ত বোঝাটাই মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি এবং ছাঁটাই ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনসাধারণকেই বইতে হবে।

এ কথা আজ পরিষ্কার যে, গভীর এই পুঁজিবাদী সংকটের আবর্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে সরকার। কখনও কেইনসীয় নীতির টোটকা, কখনও মুক্ত বাজার নীতির তাবিজ— কোনও কিছুই পুঁজিবাদকে স্থায়ী মন্দার মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাতে পারছে না। দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষও তাদের অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝছে যে, উদার আর্থিক নীতিই হোক, বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতিই হোক, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার, অস্বাস্থ্য ছাড়া কোনও সুফলই তাদের কাছে পৌঁছায় না, সুফল শুধু মালিকরাই ভোগ করে। কারণ এই ব্যবস্থার সব কিছুই পরিচালিত হয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে।

দেশে আজও সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। অথচ কৃষকের সারা বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল কৃষি-ফসলের লাভজনক দাম পাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি। অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো এখানেও সরকার কৃষকদের পরিবর্তে কৃষি পণ্যের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। কৃষকদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে চলেছে দেশি-বিদেশি কৃষি-পণ্যের ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, সার, ওষুধ এবং বীজের কোম্পানিগুলি। অথচ এদের তীব্র শোষণের হাত থেকে কৃষকদের সরকার রক্ষা করলে দেশের বিপুল অংশের কৃষক-জনতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ত, যা স্বাভাবিক নিয়মেই অভ্যন্তরীণ বাজারকে চাঙ্গা রাখত। আসলে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ উল্টো— পুঁজিবাদী সরকার হিসাবে তারা সব কিছুই দেখে মালিকদের চোখ দিয়ে, বিচার করে মালিকদের বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা তাদের উদ্দেশ্যই নয়। মালিকদের মুনাফার স্বার্থ অটুট রাখতে জনসাধারণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু না করলে নয়, তারা করে শুধু ততটুকুই।

মালিকদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণার পাশাপাশি সরকার ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গৃহঋণকে অগ্রাধিকার তালিকায় এনে গৃহঋণে সুদের হার কমানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল, সুদের হার কিছুটা কমিয়ে মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশকে গৃহঋণ নেওয়ায় উৎসাহিত করা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের মূলে যে মার্কিন অর্থনীতির সংকট রয়েছে, তার অন্যতম কারণ ঋণ-নির্ভর মার্কিন অর্থনীতি, যার দ্বারা কৃত্রিমভাবে ওই দেশে ভোগ্যপণ্যের বাজারকে ফাঁপিয়ে রাখা হয়েছিল। আমেরিকায় বিরাট অংশের মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে যে শোধ করতে পারেনি এবং তার ফলে বহু ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে, তার অন্যতম কারণ তা শোধ করার তাদের কোনও ক্ষমতা নেই। তাদের আয় বাড়েনি, বরং মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে তা কমেছে। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষেত্রে ধস থেকে বর্তমান মন্দা সৃষ্টি হয়নি, বিপরীতটাই সত্য। বর্তমান আর্থিক ধসের মূলে রয়েছে দীর্ঘকালের গভীর মন্দা।

আটের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

[গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার কারাকাসে লাতিন আমেরিকান পার্লামেন্টের সপ্তম অধিবেশনে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী 'সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ' বিষয়ে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এখানে সেটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল।]

নিপীড়িত মানুষ এবং পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধাদের গায়ে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা লাগানোটা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বহুদিন ধরে ব্যবহৃত একটা পুরনো কৌশল। ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ভারতীয়দের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেখানে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হত এবং ফাঁসিতে ঝোলানো হত, সেখানে আপসকামী নেতাদের সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নরম মনোভাব দেখাত, এমনকী তাদের মদতও দিত। অন্যান্য দেশেও একই ঘটনা পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলাকে ২৭ বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, এই সেদিন পর্যন্ত তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী তালিকায় রাখা হয়েছিল। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা, সাইপ্রাসের আর্চবিশপ মাকারিস, জিম্বাবোয়ের রবার্ট মুগাবে প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শোষণ-নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামী মানুষ যখনই আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিচ্ছে, তখনই তারা সন্ত্রাসবাদীদের মতো তাড়া খাচ্ছে। অথচ যখন নিরপরাধ নাগরিকদের উপর সাম্রাজ্যবাদীরা বিরামহীন বোমাবর্ষণ করছে, তখন তাকে মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে স্বাগত জানানো হচ্ছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চালু প্রচার ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের কার্যকলাপই আন্তর্জাতিক 'সন্ত্রাসবাদের' জন্য দায়ী। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পতনের দীর্ঘদিন পরেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনাগুলি প্রায় নিয়মিতভাবে ঘটে চলেছে এবং বাড়ছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের সেই প্রচার যে কত মিথ্যা ছিল, তা এখন প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে, জনসাধারণ তাদের মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্ত লড়াই করেও যখন পরাজিত হয়, তখন বাধ্য হয়ে শেষ আশ্রয় হিসাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।

ইতিহাস দেখিয়েছে যে, নিরীহ মানুষ যখন নির্যাতিত হয়, অত্যাচারিত হয়, তার অধিকার ভঙ্গ হয়, যখন তার জীবনধারণের উপকরণ থেকে সে বঞ্চিত হয়, অথচ সে দেখে যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগগুলির প্রতি কর্ণপাতই করছে না, তখন জনগণের অসহায়ত্ব এবং হতাশাই হিংসার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পদের অসম বণ্টন, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে সর্বহারাশ্রেণীকে পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ, গরিব দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু উপজাতির উপর দমনপীড়ন — এই সমস্ত কিছুই হিংসা সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগায়। কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য জনগণের হতাশা-বিক্ষোভ-ক্রোধকে উস্কানি দিয়ে তাদের সমর্থন জোগাড় করে। আমরা এখানে ব্যক্তিবিশেষের হঠকারী হিংসাত্মক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি না, বরং যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর মূল কারণ তার কথা বলছি। সাধারণ মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, কারণ, তাদের উৎপীড়করা অস্ত্রে শুধু সমৃদ্ধ তাই নয়, তারা এই অস্ত্র সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে নির্মমভাবে ব্যবহার করে। ইতিহাস দেখিয়েছে, জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রাম যেখানেই জয়যুক্ত হয়েছে, সেখানেই এই জয় এসেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমি এখানে যে বিষয়টার উপর জোর দিতে চাই, তা হল, হতাশাজনিত কার্যকলাপ এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর পরিষ্কার লক্ষ্যে দৃঢ় আদর্শের ভিত্তিতে জনসাধারণের সংগঠিত আন্দোলন — এ দু'টিকে এক করে ফেলা উচিত নয়।

মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি হচ্ছে এর জ্বলন্ত উদাহরণ। ষাট বছর আগে স্থানীয় প্যালেস্তাইনি অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের চক্রান্ত করেছে, তখন থেকেই সংঘর্ষ এবং হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইজরায়েল তার জন্ম-মুহূর্ত থেকেই লক্ষ লক্ষ আরব জনগণকে তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করার, জোর করে জমি নিয়ে নেওয়ার এবং এলাকা দখলের জন্য হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে, একটা গোটা জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু শিবিরে নির্বাসিত হয় এবং সেখানে বছরের পর বছর চরম দারিদ্রের মধ্যে তাদের বাস করতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ মানবিক মর্যাদাময় জীবনের মৌলিক সমস্ত উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে একটা সমগ্র প্রজন্ম বড় হয়েছে। ইজরায়েল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্যালেস্তাইনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কোনও নজরই দেয়নি। পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ইজরায়েল এই সমস্যার সম্মানজনক মীমাংসার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে বারবার অস্বীকার করেছে। ইজরায়েল শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তাইনিকে তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িতই করেনি, নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণ করে নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের হত্যা করেছে, বুলডোজার চালিয়ে বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে মানুষকে গৃহহীন করেছে। তাই মানুষের বিক্ষোভ প্রায়শই হিংসাত্মক আকারে ফেটে পড়েছে। এগিয়ে আসা ইজরায়েলি ট্যাঙ্কের সামনে একটি শিশু যখন শুধুমাত্র পাথর হাতে রুখে দাঁড়ায়, তখন তা থেকে সহজেই প্যালেস্তাইনিদের ক্রোধ এবং সাহসিকতাকে বোঝা যায়। যে কোনও সশস্ত্র লড়াকু বিরোধিতাকে ইজরায়েল এবং তার সাম্রাজ্যবাদী দোসররা সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যা দেয়। হামাস যখন নির্বাচনের মাধ্যমে প্যালেস্তাইনে বিপুলভাবে জয়যুক্ত হল, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের আতঙ্ক গোপন করতে পারেনি। তারা এই জয়কে অস্বীকার করে এবং হামাস ও সংগ্রামী প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে ইজরায়েল তার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ শুরু করে দেয়।

লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অন্যান্য প্রতিটি অঞ্চলে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একই প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকার বহু দেশের ক্ষমতাসীন দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলির সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আঁতাত আছে এবং তাদের যোগসাজসেই এগুলি কাজ করছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এই দেশগুলিকে চূড়ান্তভাবে লুণ্ঠন করছে। ফলে সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যখন কোনও কার্যকরী সংগ্রামী শক্তি বিদেশি ব্যবসায়িক স্বার্থকে বিতাড়িত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠতে থাকে, তখন তার গায়ে তাড়াতাড়ি সন্ত্রাসবাদী ছাপ মারা হয় এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ শক্তিকে তার বিরুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয়। কোনও রাষ্ট্র যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার সাহস দেখায়, তাহলে তাকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সশস্ত্র আক্রমণ এবং খোলাখুলি আগ্রাসনের সম্মুখীন হতে হয় — যা কিউবা এবং ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে ঘটছে।

আফ্রিকার সুদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করে তার আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্য একটি স্বাধীন নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এই দেশটি একদিকে যেমন তার তৈলসম্পদকে মার্কিনদের করায়ত্ত করার অপচেষ্টাকে অনুমোদন করেনি, তেমনই মার্কিনবাহিনীর ইরাক আক্রমণ ও দখলদারিকে সমর্থন করেনি। এই ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, যার ফলে সে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে চক্রান্ত করে সুদানের রাষ্ট্রপতি ওমর হাসান আল-বসিরকে 'যুদ্ধাপরাধী' এবং 'মানবতাবিরোধী' হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টে অভিযুক্ত করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি ও দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করার জঘন্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ায় স্লোবোদান মিলোশেভিচ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কুৎসা প্রচার করেছে এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী' সাজিয়ে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধের ট্রাইবুনাল বসিয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বড় বড় নীতিকথা আউড়ে ইরাক, আফগানিস্থানকে ধ্বংস করতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধ' শুরু করেন। অথচ মার্কিন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সমর্থন করার এবং মদত জোগানোর এক দীর্ঘ ইতিহাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে। যুগোশ্লাভিয়া-কসোভো লিবারেশন আর্মিকে, ইরাকে জুন্দাল্লাহ্ বা ইরানী জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং এম ই কে বা মুজাহিদিন-ই-খালেককে, আফগানিস্তানে মুজাহিদিনকে, আর্মেনিয়ার তাশানাককে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই মদত দিয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মার্কিন বিরোধী দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালানোর জন্য এদের অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হয়। সি আই এ আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ সন্ত্রাসবাদীকে অন্তর্ঘাত, বোমা তৈরি এবং নগরভিত্তিক গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ওসামা বিন লাদেনকেও আফগান ধর্মযুদ্ধের (ক্রুশেড) সময় আমেরিকা প্রচুর অর্থ জুগিয়েছে।

এমনকী আমেরিকার জর্জিয়াতে মার্কিন সরকার ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফেয়ার ইনস্টিটিউট অব্ সিকিউরিটি কর্পোরেশন (আগে 'স্কুল অব আমেরিকা' বলা হত) নামে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অর্থের জোগান দিয়েছে। লাতিন আমেরিকার বহু জঘন্য অত্যাচারী, গণহত্যাকারী, স্বৈরাচারী শাসক এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীরা এই ইনস্টিটিউটের পূর্বতন সদস্য। গুয়াতেমালা, এল সালভাদোর, পানামা, চিলি, কলম্বিয়া এবং অন্যান্য বহু দেশে নির্মম অত্যাচারের জন্য এরাই দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাদের শত্রু বলে মনে করে, তাদের ধ্বংস করার জন্য সন্ত্রাসবাদী বাহিনী তৈরি করার যে মার্কিন নীতি, সেটাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের জন্ম দিচ্ছে, যারা পরবর্তীকালে আমেরিকার বিরুদ্ধেই তাদের বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ধরছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে অত্যাচারী, অগণতান্ত্রিক, প্রবল দমনমূলক বেআইনি সরকারগুলিকে অর্থ এবং যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং গণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে বন্ধ করে দেয়, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রত্যেকেই জানেন। বহু বছর ধরে এরা পানামার ম্যানুয়েল নরিয়েগা এবং চিলির পিনোচেতের মতো বহু অপরাধে অভিযুক্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, চিলি, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়ার মত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলি অকল্পনীয়, অকথ্য অত্যাচার, হত্যা, জাতিদাঙ্গার মত অপরাধে অপরাধী। তারা ছাত্র-শিক্ষক-ধর্মযাজক-সন্ন্যাসিনীদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রত্যেকটি দেশকেই আর্থিক-সামরিক সাহায্য করেছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে কলাকৌশল দিয়ে এবং কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে এই প্রত্যেকটি দেশকে পিছন থেকে সরাসরি মদত দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে যে অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে, সেগুলিকে তারা প্যালেস্তিনীয় জনগণ এবং সামরিক অধিগৃহীত এলাকাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। এরা ইজরায়েলের পারমাণবিক ক্ষমতার প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে, অন্যদিকে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার মিথ্যা অজুহাতে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের তথাকথিত পবিত্র, শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য ইরানকে হুমকি দিচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানেও সমস্ত রকমের মৌলিক অধিকার হরণকারী, মৌলবাদীদের চরম সমর্থক সামরিক একনায়ক মুশারফের সাথে আমেরিকা জোটবদ্ধ হয়েছে। গোটা দুনিয়াতেই আমেরিকা যেভাবে অত্যাচারী শাসকদের সমর্থন করে চলেছে, তার ফলে আমেরিকার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হিংসাত্মক আক্রমণও এই সমস্ত অত্যাচারিত দেশের মানুষের পরোক্ষ সমর্থনও পাচ্ছে। কিন্তু এইসব ঘটনায় মার্কিন শাসকরা নিবৃত্ত হয় না এবং কেন এতগুলি দেশের জনগণ মার্কিন নীতিকে ঘৃণা করে, তার কারণগুলি নিয়ে যুক্তিসম্মত পর্যালোচনা না করে সেগুলিকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন হিসাবেই দেখে। যেকোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপ যে আরও বড় হিংসার জন্ম দেয়, এই কথা বুঝতে মার্কিন শাসকরা আজ অপারগ।

লাতিন আমেরিকা এবং বর্তমানে আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য আমেরিকা নিজে দায়ী। এইজন্যই নোয়াম চমস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'প্রধান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলেছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর আর্ন মেয়ার বলেছেন, ''১৯৪৭ সাল থেকেই দেশে দেশে হামলাকারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রথম এবং মূলশক্তি হল আমেরিকা।'' ভিয়েতনামে আমেরিকার বর্বর হামলা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রাক্‌মুহূর্তে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের কথা আমরা সবাই জানি। এগুলি কি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়? ১৯৫৯ সাল থেকে সিআইএ এবং পেন্টাগন কিউবাতে অসংখ্যবার আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে এবং আক্রমণ করেওছে। তারা ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে এবং এগুলি তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ বহুগুণ বেড়ে গেছে এবং এরা কিউবাতে একের পর এক আক্রমণ বিরামহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কিউবা ও ভেনেজুয়েলার সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত বহু অপরাধী আমেরিকায় আশ্রয় খুঁজছে এবং সেখানে রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় পাচ্ছে। অন্যদিকে কিউবার বহু নাগরিক মিথ্যা অভিযোগে আমেরিকার জেলে বন্দী হয়ে রয়েছে।

১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সি আই এ'র মদতে দক্ষিণপন্থী গেরিলা গোষ্ঠী 'কন্ট্রা' নিকারাগুয়াতে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালায়। লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। গোটা দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'বেআইনি শক্তি প্রয়োগে'র অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের

পাঁচের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেই সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব

চারের পাতার পর

নির্দেশ দেয়। নিরাপত্তা পরিষদ এবং রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা এই কাজের নিন্দা করে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবজ্ঞার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৫ সালে রেগন জমানায় বেইরুটে মুসলিম ধর্মস্থানকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে শত শত সাধারণ মানুষ নিহত ও আহত হয়। ১৯৯৮ সালে সুদানে একটি ওষুধের কারখানায় রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে, এই অজুহাতে মিসাইল আক্রমণ চালানো হয়, যদিও পরে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই আক্রমণের ফলে সুদানে পাওয়া যায় এমন ৬০ শতাংশ ওষুধের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসামাল হয়ে পড়ে। ইরাকের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণের পর অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করলে শিশু সহ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। আফগানিস্তানে বোমা ফেলে সেই দেশকে আমেরিকা শুধু ধ্বংসই করেনি, উপরন্তু পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধ করে — যাতে আফগানিস্তানের মানুষ অনাহারে মারা যায়। আবু গ্রাইবের বন্দীদের ওপর এবং গুয়ান্তানামো কারাগারে অত্যাচারের কাহিনী মার্কিন রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে লিবিয়া, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মধ্য আমেরিকার অসহায় মানুষদের ওপর বোমা বর্ষণ করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই তালিকা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এইভাবে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা যদি সন্ত্রাসবাদ না হয়, তবে সেটা কী?

বর্তমানে বিশ্বায়নের নামে সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের সেবাদাসেরা বিভিন্ন দেশের মানুষের ওপর চরম শোষণ নামিয়ে আনছে। জীবিকাচ্যুত করা, বেকারি, জমি থেকে উচ্ছেদ, জীবনযাপনের প্রচলিত উপায়গুলিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ যত সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে, ততই পুঁজিবাদী শাসকেরা সেই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করছে। আজ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের নীতিই হল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও আজ বিভিন্ন রূপে দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার তার নিজের দেশের জনগণকেই দমন করে এবং দাবিয়ে রাখে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাজানো বিচার, সন্দেহভাজন বিরোধীদের পরিবার বা বন্ধুদেরও শাস্তি দেওয়া, জনগণের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূতভাবে পুলিশ এবং মিলিটারির ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কখনও কখনও সরকারি কর্মচারী বা ঘাতকবাহিনী দিয়ে রাষ্ট্রের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী অভিযোগ তুলে হেনস্থা করা হচ্ছে। এগুলি কোনটিই প্রকাশ্যে হয় না এবং প্রয়োজনে এইসব ক্রিয়াকলাপকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনি বিচারের রাস্তাও এরা বন্ধ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের আরেকটা রূপ হল — সরকার বিভিন্ন বেসরকারি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত দিক থেকে সহযোগিতা করে। এর প্রথম এবং প্রধান উদাহরণ হল আমেরিকা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও এই একই দোষে দোষী।

সন্ত্রাসবাদকে রোখার নামে কোনও কোনও দেশের নাগরিকদের অধিকার এবং স্বাধীনতা খর্ব করাও সাম্রাজ্যবাদীদের আর এক ধরনের কৌশল। রাষ্ট্রপতি বুশ ঘোষণা করেছেন, "স্বাধীনতা আক্রান্ত, কিন্তু স্বাধীনতা পরাজিত হবে না।" কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার (৯/১১) পর থেকে মিথ্যা শমন জারি, গোপনে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা এবং গুপ্ত বিচার প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই স্বাধীনতা আজ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত।

৯/১১-র পর থেকে আমেরিকা যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছে — যেমন, মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বিচার, গোপনে আটক রাখা এবং যেসব দেশে বন্দীদের উপর অত্যাচার অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, সেইসব দেশের সাথে আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে চুক্তি করা — এগুলো সবই মার্কিন প্রশাসনের ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে উন্মোচিত করছে। একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং মিলিটারি-শিল্পপতি জোট কমবেশি ফ্যাসিবাদী চরিত্র অর্জন করতে বাধ্য। তারা গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করছে এবং জনসাধারণের লড়াই ও শ্রেণীসংগ্রামকে নির্দয়ভাবে দমন করছে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, আধুনিক ফ্যাসিবাদ সবসময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একনায়কত্বের রূপে দেখা দেয় না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাটবাটকে সামনে রেখেও ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়। তিনি বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদ হল বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, শিল্পপুঁজি এবং লগ্নীপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি এবং অন্ধতা, গোঁড়ামি ও জাতিদম্ভের মানসিকতা বৃদ্ধিকারী সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদের মূল স্তম্ভ। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই নয়, এটি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। শাসকশ্রেণী নাগরিক অধিকারকে খর্ব করছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করছে, খোলাখুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করছে এবং জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কানি দিচ্ছে, যে কোনও ধরনের বিরোধিতাকেই নৃশংসভাবে দমন করছে। পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের দ্বারা অত্যাচার ও হত্যা, রাজনৈতিক কর্মীদের বেআইনি আটক এবং বিনাবিচারে কারাবাস আজ প্রতিদিনের ঘটনা।

সাম্রাজ্যবাদই সন্ত্রাসবাদকে আমদানি করে, তার জন্ম দেয়। তাই সন্ত্রাসবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি। শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষ, যাঁরা সন্ত্রাসবাদ মুক্ত দুনিয়া চান, তাঁদের প্রত্যেককে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার বিশ্বায়নের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত দুনিয়া গঠনের শপথ নিতে হবে। মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের পকেট ভরতে দুনিয়াকে লুঠ করছে। এরা দুর্বল জাতিগুলির সম্পদ হরণ করছে এবং এদের সস্তা শ্রমশক্তিকে শোষণ করে সর্বোচ্চ মুনাফা লুটছে। এই দুর্বল দেশগুলির অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে এরা সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। কিউবা, ভেনেজুয়েলা, উত্তর কোরিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ — যেখানেই প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, এরা সেখানেই অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করছে, সামরিক হস্তক্ষেপ করছে, আবার কোথাও সরাসরি আক্রমণ ও দখল করছে। আমরা বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে এই সমস্ত অবরুদ্ধ দেশের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার এবং তাদের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য আবেদন করছি। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থেকে মুক্তির সংগ্রামের পরিপূরক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম দেশে দেশে গড়ে তোলার দ্বারাই একমাত্র সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব। আমরা যদি গোটা বিশ্বজুড়ে এই আন্দোলন গড়ে তুলি এবং সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে সে সংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করতে পারি, তবেই আমরা সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে পারব। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপল্‌স্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এবং এই দানবীয় আক্রমণ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতেই হবে — এই আবেদন আমরা রাখছি। একমাত্র এই পথেই আমরা সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবীর জন্ম দিতে পারি, যেখানে মানুষ শান্তিতে এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারবে।

রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির জোরালো দাবি বন্দীমুক্তি কমিটির সম্মেলনে

রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত বন্দীমুক্তি কমিটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হল ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। বক্তব্য রাখেন কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নব দত্ত, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, এম এস এস-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভারতী রায়।

সম্পাদক ছোটন দাস সম্পাদকীয় রিপোর্টে বলেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আজ সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে তা বল্গাহীন। সরকারি চক্রান্তে পূর্বতন বিধায়ক প্রবোধ পুরকায়েত সহ ৪৮ জন এস ইউ সি আই কর্মী ও ১০ জন মাওবাদী কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বিরোধী সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে সরকার দমনপীড়নের আশ্রয় নিচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে বন্দীরা রাজবন্দীর মর্যাদা পাচ্ছেন না। এস ইউ সি আই-এর প্রায় ১১০০ কর্মীকে মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গণআন্দোলনে ধৃত প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাজানো মামলা রয়েছে। ৬০০ জনের মতো রাজনৈতিক বন্দী কারাগারে। এদের অনেকেই ২-৩ বছর ধরে বিনা বিচারে আটক রয়েছে। জেল হাজতে মৃত্যু আজ নিত্যদিনের ঘটনা। অথচ, 'নিঃশর্ত মুক্তি'র যে দাবি বন্দীমুক্তি কমিটি তুলেছে, তা আজও সামাজিক দাবি বা সমাজের একটি প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠেনি, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলির কর্মসূচিতে এখনও এই দাবি স্থান পায়নি।

সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। বীরভূমের কার্তিক হাজরা, কলকাতার আইনজীবী দীপক মুখার্জী, সুজাত ভদ্র, সি পি ডি আর এস-এর ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, পুরুলিয়ার গৌতম হাতি, নদীয়ার জয়দীপ চৌধুরী, বাঁকুড়ার রাজেন মুখার্জী, উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামল দাশগুপ্ত ছাড়াও অনেক প্রতিনিধি তাঁদের জেলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে অন্যান্য সঙ্গীতকদের সঙ্গে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত ও দ্বিজদাস চ্যাটার্জী।

প্রকাশ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জননেত্রী মেধা পাটকর। তিনি যৌথ আন্দোলনের উপর জোর দেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার, অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রানা, অমিত ভট্টাচার্য, অলক ভট্টাচার্য, এ পি ডি আর-এর দেবপ্রসাদ চৌধুরী, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রমুখ। এই অধিবেশনে সঙ্গীতকদের অন্যতম ছিলেন সদানন্দ বাগল।

সম্মেলন থেকে ছোটন দাসকে সম্পাদক করে ৪৫ জনের রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মানস জোয়ারদার।

এ আই এম এস এস-এর গোসাবা ব্লক সম্মেলন

১৬ নভেম্বর সাতজেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার গোসাবা ব্লক দ্বিতীয় সম্মেলন। পণপ্রথা, নারীনির্যাতন, বধূহত্যা, যৌনশিক্ষা, মদের লাইসেন্স প্রতিরোধ সহ খেয়াভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ ও পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় ২৫০ জন মহিলা এই সম্মেলনে অংশ নেন।

কমরেড সীমা মণ্ডলকে সভানেত্রী করে সভার কাজ শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড ইলা সরকার। কমরেড করুণা মণ্ডল সহ ৮ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই নেতা কমরেড নির্মল সরকার। আগামীদিনের আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমরেড সীমা মণ্ডলকে সভাপতি এবং কমরেডস্ ইলা সরকার ও করুণা মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ৪৮ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনের শেষ পর্বে মহিলাদের মধ্যে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় নবজাগরণের দুই মনীষী বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্রের মহান শিক্ষাগুলি চর্চা করার আহ্বান জানান।

সারের দাবিতে ধূপগুড়িতে কৃষক বিক্ষোভ

স্থানীয় 'লার্জ সাইজ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটি প্রতিশ্রুতি মতো সার প্রদান করবে এই আশায় জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির কৃষকরা ২৮ নভেম্বর সোসাইটির সার বিক্রয় কেন্দ্রে সমবেত হন। কিন্তু সোসাইটির ম্যানেজার ব্যাপক কৃষকের জমায়েত দেখে সার বণ্টন করা যাবে না বলে জানান। সারের মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারিতে বিপর্যস্ত কৃষকরা এই ঘোষণায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ কিন্তু চাষিদের সংগ্রামী দৃঢ়তার সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এডিও উপস্থিত হন। সমবায় কর্তৃপক্ষ, এডিও এবং কৃষক প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেন। কৃষকদের পক্ষে তছিবর রহমান, রঘুনাথ রায়, মহিরুদ্দিন, দিলীপ শাখারী, সমসের আলী আলোচনায় অংশ নেন। সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিদিন ২০০ জন চাষিকে সার দেওয়া হবে। সরকার নির্ধারিত দামে সার না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ধূপগুড়ি কৃষক সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসাবে তছিবর রহমান ও সম্পাদক হিসাবে সমসের আলী নির্বাচিত হয়েছেন।

দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্যোগ পরিচারিকা সমিতির

পরিচারিকা মায়েদের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র হিসাবে 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি'র পুরুলিয়া জেলার ঝালদা শাখার উদ্যোগে গড়ে উঠল 'প্রীতিলতা ফ্রি-কোচিং সেন্টার' ও 'নিবেদিতা ফ্রি-কোচিং সেন্টার'। ৩০ নভেম্বর উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পিনাকীরঞ্জন রক্ষিত। তাছাড়া ছিলেন পরিচারিকা সমিতির মিনতি সেন, বেলা কান্দু এবং জেলা সম্পাদিকা শোভা মাহাতো।

ধর্মঘট ভাঙতে মালিক-সিপিএম-প্রশাসনের ঘৃণ্য চক্রান্ত

একের পাতার পর

দালাল ইউনিয়নের শত প্ররোচনা উপেক্ষা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

১৭ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। চটকল মালিকরা পি এফ এবং ই এস আই বাবদ ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। শ্রমিকদের দাবি এই টাকা দিতে হবে। গ্র্যাচুইটির ৩০০ কোটি টাকা মালিক আত্মসাৎ করেছে। ধর্মঘটের দাবি সমস্ত বকেয়া ফেরৎ দিতে হবে।

কেন মালিকরা ডি এ দিচ্ছে না? প্রশ্ন করায় ইদ্রিস জানালেন, মালিকরা বলছে তাদের লোকসান হচ্ছে। বাজারে মন্দা। কমপিটিশানের মার্কেটে ব্যবসা ভাল চলছে না। অথচ দেখুন, ইজমার প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় কাজারিয়া হেস্টিংস জুটমিল চালাতে চালাতে আড়াই থেকে ৩ বছরের মধ্যে ইন্ডিয়া জুটমিল কিনে নিয়েছে। তারপর চাঁপদানিতে জুটমিলের যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানা করেছে, হাওড়ায় সিন্থেটিক কারখানা, শক্তিগড়ে আরেকটি জুট কারখানা করেছে। এসব কি লোকসানের নমুনা?

ক্ষোভের আঁচ কারখানার আনাচে কানাচে। গ্যাঞ্জেস জুটমিলে ২৭ বছর ধরে কাজ করছেন শ্রমিক নেতা অযোধ্যালাল মাহাতো। তিনি ক্ষোভের সাথে জানালেন, ডি এ নিয়ে, পি এফ নিয়ে, ই এস আই নিয়ে হরতাল করতে হবে এটা আগে ভাবিনি। এগুলি অর্জিত অধিকার। আইনে স্বীকৃত। এগুলি মালিক দিতে বাধ্য। আজ এগুলি নিয়েও ধর্মঘট করতে হচ্ছে। এই মিলের আর এক শ্রমিক নেতা বি ভাস্কর রাও বললেন, আমরা চাই সমকাজে সমবেতন। অবসরের পর সেই জায়গায় লোক নেওয়া হচ্ছে না। সেখানে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি এই ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান শক্তি। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য জানালেন, কোনও মালিকই ফ্যাক্টরি আইনের তোয়াক্কা করছে না। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এক একজন শ্রমিকের ২৭/২৮ হাজার টাকা পাওনা। মালিকরা দিচ্ছে না। মাসিক বেতন ১০০০ টাকা করে কম দিচ্ছে। আড়াই লক্ষ শ্রমিকের কোটি কোটি টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদত না থাকলে মালিকরা এই সাহস পায় কোথা থেকে? ৩২ বছর ধরে সিপিএম ক্ষমতায়। শ্রম আইন যথাযথ প্রয়োগ করলে, আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিলে মালিকদের ঔদ্ধত্য এতদূর যেতে পারত কি? মালিকরা এগুলো মানলে ধর্মঘটের

কোনও প্রয়োজনই ছিল না। মালিকরাই ধর্মঘটের পথে শ্রমিকদের ঠেলে দিয়েছে।

এই ধর্মঘট ভাঙতে সিটু নেতৃত্ব যে ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে সে সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন ক্ষোভের সাথে বলেন, সিটু নেতৃত্ব প্রেস বিবৃতিতে বলেছিল, শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য। তাই ধর্মঘটের আহ্বান থেকে সরে গেলেও তারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করবে না। কিন্তু বহু জায়গায় তারা প্রত্যক্ষভাবে মালিকের সাথে যোগসাজশে কিছু সমাজবিরোধী ব্যবহার করে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করছে।

১০ ডিসেম্বর ধর্মঘটের দশম দিনে হাওড়া ও জগদ্দলের মেঘনা জুটমিলে মালিকরা ভাড়াটে গুণ্ডা এনে সিপিএম নেতৃত্বের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছে। ইস্টার্ন জুটমিলে স্থানীয় এক কুখ্যাত গুণ্ডা এবং প্রোমোটার শ্রমিকদের রিভলবার ঠেকিয়ে জোর করে ধরে এনে কারখানায় ঢুকিয়েছে। বালি, হাওড়া, অম্বিকা জুটমিলে ধর্মঘট ভাঙার ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। বালি স্টেশনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর দৈহিক আক্রমণ করা হয়েছে। সর্বত্রই পুলিশ নির্বিকার। হাওড়া জেলা প্রশাসন এই ধর্মঘট ভাঙার চক্রান্তে লিপ্ত। হুগলিতে গ্যাঞ্জেস জুটমিলের গেটে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে যাতে শ্রমিকরা সমবেত হতে না পারে। অন্যদিকে মালিকরা শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা না দিয়ে ধর্মঘট ভাঙতে টাকার বস্তা নিয়ে নেমেছে। কিন্তু সংগ্রামী ধর্মঘটী শ্রমিকরা ঘৃণাভরে সে সব প্রত্যাখ্যান করছে।

সিটু নেতৃত্বের এই ভূমিকায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ। সিটুর ফ্যাক্টরি লেভেলের শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের পক্ষে। তারা ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর। শ্রমমন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জী বলেছেন— শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য, কিন্তু মালিকদের চাপ দিতে পারি না। সিটুর কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, এখন যা পরিস্থিতি তাতে আন্দোলন করা উচিত নয়। এই কারণে সিটু ধর্মঘটে সামিল হয়নি। সিটুর নেতৃত্ব কাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন এই বক্তব্যেই তা পরিষ্কার।

মালিক, প্রশাসন এবং দালাল ইউনিয়নের এতসব আক্রমণ সত্ত্বেও শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কারণ তারা জানে, মালিকরা করুণা করে তাদের কিছু দেবে না। তাদের শ্রম লুণ্ঠন করেই মালিকদের বিপুল বৈভব। লড়াই করে দাবি আদায় করে নিতে হবে। এই ধর্মঘটের জন্য তো বহু পরিবার অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে? এক শ্রমিক বললেন, মালিকরা মাসের পর মাস লকআউট করে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা আমাদের অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে। এ আমাদের নিত্যসঙ্গী। দু'বেলা খাচ্ছিলাম, এখন একবেলা খাব। কিন্তু আমরা ডি এ নিয়েই ছাড়ব। রোজ রোজ মরব কেন? লড়াই করেই মরব। এই হল ধর্মঘটী শ্রমিকদের মেজাজ। হেস্টিংসের সইফুদ্দিন, ওয়েলিংটনের মুলায়ম যাদব, ভদ্রেশ্বরের রাজেশ সাউ, শম্ভু দাস, ভিক্টোরিয়ার ফাঁসি আহমেদ, গোন্দলপাড়ায় গোবিন্দ রায়, লাড্ডু চৌধুরীরা জানালেন, মালিকের মার, রাষ্ট্রের মার অনেক খেয়েছি। আর মারকে ভয় পাই না।

শ্রমিকরা এই সভ্যতার স্রষ্টা। তারাই ঘাম ঝরিয়ে, দেহকে কয়লার মতো পুড়িয়ে এই সভ্যতার গতিশীলতা বজায় রেখেছে। কিন্তু মালিকী ব্যবস্থা তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকদের মজুরি কমাচ্ছে, শ্রমিকদের আইনি প্রাপ্যগুলি দিতে অস্বীকার করছে। স্থায়ী চাকরি বন্ধ করে অল্প বেতনের অস্থায়ী কিছু শ্রমিক নিয়োগ করছে। পুঁজিবাদের সংকট যত তীব্র হচ্ছে পুঁজিপতিরা সেই সংকটের বোঝা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধর্মঘট করে, আন্দোলন করে যদি দু'একটি দাবি আদায় হয়ও, আবার এই সংকট আসবে যদি না এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই পাল্টানো যায়। এই অর্থে চটকল শ্রমিকদের এ লড়াই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়েরই অঙ্গ। অর্ধভুক্ত উপবাসক্লিষ্ট ধর্মঘটী শ্রমিকদের চোখেমুখে সেই লড়াইয়েরই বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

তেলের দাম কমেছে, বাসের ভাড়া এখনই কমাতে হবে

পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়লেই যে বাসমালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হয়, তাদের ইচ্ছামতো ভাড়া না বাড়ালে ধর্মঘট ডাকে, এবার পেট্রল-ডিজেলের দাম যখন বিপুল ভাবে কমে গেছে, তখন সেই মালিকরাই ভাড়া কমানোর বিরোধিতা করছে। একইভাবে 'তেলের দাম বাড়লে ভাড়াবৃদ্ধি কেন হবে না, বাস কি জলে চলে' এই যুক্তি দিয়ে ভাড়াবৃদ্ধিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন পরিবহন মন্ত্রী নামের আড়ালে বাসমালিকদের যে মন্ত্রী, এবার তিনিও যথারীতি নীরব। কারণ সরকারও বাসের মালিক। সেও যাত্রীসাধারণের পকেট লুঠ করে মুনাফা করছে।

জ্বালানির দাম বাড়লে যদি ভাড়াবৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে দাম কমলে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার কেন যুক্তিযুক্ত হবে না? এ বছরের জুন মাসে ডিজেলে লিটার প্রতি দাম বেড়েছিল ১.৬২ টাকা। আর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডিজেলে লিটার প্রতি দাম কমল ১.৮৯ টাকা। অর্থাৎ যতটুকু দাম বেড়েছিল তার থেকে বেশি পরিমাণেই কমেছে। তাহলে জুন মাসে যতটুকু ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল সেটা অন্তত তুলে নেওয়া হবে না কেন?

কত ভাড়া বেড়েছিল জুন মাসে? গত জুনে ভাড়াবৃদ্ধির সময় ৪ টাকার পরের স্টেজেই, মধ্যবর্তী স্টেজের ৫ টাকা ভাড়া পুরোপুরি তুলে দিয়ে, ভাড়া করে দেওয়া হল একেবারে ৬ টাকা। অর্থাৎ এক ধাক্কায় ১ টাকা ভাড়া বেড়ে গেল। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য একটা বাসের দৈনিক খরচ সে সময় কতটুকু বেড়েছিল? একটি বাসে দৈনিক ৬০ লিটার ডিজেল লাগে। ১.৬২ টাকা হিসাবে একটি বাসের দৈনিক খরচ বৃদ্ধি মোট ৯৭.২০ টাকা। একটি বাস দৈনিক গড়ে ৭০০ জন যাত্রী পরিবহন করে। ফলে যাত্রীপিছু ১৫ পয়সা ভাড়া বাড়ালেই মালিকদের এই বাড়তি খরচ উঠে যেত। কিন্তু বাড়ানো হয়েছে কত? ১৫ পয়সার জায়গায়, দেখা গেল তার প্রায় ৭ গুণ বেশি ভাড়া বাড়িয়ে মালিকদের বিপুল পরিমাণ লাভের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এখন তেলের দাম কমে যাওয়ায় পাছে বাসভাড়া কমানোর দাবি ওঠে, তাই মালিকরা গাওনা গাইছে যে, যন্ত্রাংশের দাম বেড়েছে সুতরাং ভাড়া কমানো যাবে না। দেখা যাচ্ছে, যখন ডিজেলের দাম বাড়ে তখন ভাড়া বেশি করে বাড়ানোর জন্য মালিকরা যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি তোলে, যাতে ভাড়াবৃদ্ধি কত জরুরি তা প্রমাণ করা যায়। আবার যখন তেলের দাম কমে, তখনও মালিকরা একই মন্ত্র জপতে থাকে, যাতে ভাড়া কমানোর দাবি না ওঠে। অন্য সময়ে কিন্তু এ নিয়ে মালিকদের কোনও উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। ফলে যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির কথা যে আসলে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বেশি ভাড়া আদায় করার একটা মালিকী অপকৌশল, একথা বোঝা খুব দুঃসাধ্য নয়।

শুধু ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেই ভাড়া বাড়ানো হয় না, একই সঙ্গে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের অজুহাতও তোলা হয়। ভাড়াবৃদ্ধির এক নোটিশে পরিবহণ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ভাড়াবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হল যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। ২০০৩ সালে যখন ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়ানো হয়, তখন বলা হয়েছিল এর ৯ শতাংশ খরচ করা হবে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে। অথচ ভুক্তভোগী মানুষ জানেন, বাসে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য কী ধরনের। আসন সংখ্যার চেয়ে বহু গুণ বেশি যাত্রী নেওয়া হয়; বেশিরভাগ সিটগুলিই বসার অযোগ্য, দুটি সিটের মাঝে ন্যূনতম ফাঁকটুকুও থাকে না, মর্জিমাফিক কখনও ধীরে কখনও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ঝঞ্ঝাট সহ নানা দুর্ভোগ যাত্রীদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। মালিকরা কার্যত যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ব্যবস্থা না করেই যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের নামে আদায় করা ভাড়ার টাকা পুরোটাই দীর্ঘদিন ধরে মুনাফা হিসাবে ঘরে তুলছে। ফলে মালিকদের লোকসান হচ্ছে বা এখন ভাড়া কমালে লোকসান হবে, এ কথা কোনও যুক্তিতেই দাঁড়ায় না।

তাহলে রাজ্যের সিপিএম সরকার বাসের ভাড়া কমাচ্ছে না কেন? আসলে, জনগণের স্বার্থ, জনগণের উন্নয়ন ইত্যাদি যে সব মন্ত্র সিপিএম আওড়ায় তার সবই ভড়ং। পরিবহণের মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবায় বাসমালিকরা এবং স্বয়ং সরকার জনসাধারণকে বেশি ভাড়া দিতে বাধ্য করে তাদের পকেট কেটে চলেছে। জনসাধারণ অসংগঠিত বলেই এ ঘটনা ঘটতে পারছে। মালিক এবং সরকার পক্ষের এই চূড়ান্ত জনবিরোধী ভূমিকা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যাত্রীরা কমিটি গঠন করে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে না তুললে হাজারো যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও এক পয়সাও ভাড়া কমবে না। কারণ এই জনবিরোধী সরকার জনস্বার্থে তোলা কোনও যুক্তিকেই গ্রাহ্য করে না। একমাত্র গণআন্দোলনের চাপেই তার অন্যায় অত্যাচারকে রুখে দেওয়া যায়, ন্যায্য দাবি আদায় করা যায়। একই কথা প্রযোজ্য কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সম্পর্কেও। সাধারণ মানুষের ভালমন্দের বিষয়ে সামান্য চিন্তা থাকলে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যখন ৭০ শতাংশের বেশি কমল, অনেক টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রলে মাত্র ১০ শতাংশ এবং ডিজেলে ৫ শতাংশ দাম কমাতো না। দাম আরও কমানোর সাথে সাথে দরিদ্র-মধ্যবিত্তের ব্যবহার্য কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দামও কমাতো। জনসাধারণের দুর্দশামোচনের কোনও আবেদনেই যে এই সব সরকার সাড়া দেবে না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আন্দোলনের চাপ ছাড়া এদের জনস্বার্থের কথা ভাবাতে বাধ্য করার অন্য কোনও বিকল্প রাস্তা খোলা নেই

বিশ্বজুড়ে কাজ হারাচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীরা

যে তীব্র সংকটের ধাক্কায় গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আজ টালমাটাল, বিপুলতার দিক দিয়ে বিচার করলে তাকে এককথায় ঐতিহাসিক বলা যায়। শুধু ২৮ কোটি মানুষের দেশ আমেরিকাতেই এ বছরে এ পর্যন্ত কাজ হারিয়েছে ১২ লক্ষ শ্রমিক। বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এই হার বেড়ে ৮ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। সেখানে অক্টোবর মাসে কেনাকাটার হার ৩ শতাংশ কমে গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বড়দিনের এই কেনাকাটার মরশুমেও শপিং মলগুলি ফাঁকা, দোকানদারেরা রঙবাহারি পণ্য সাজিয়ে খরিদ্দারদের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।

সিটি ব্যাঙ্ক ছাঁটাই করেছে ৫৩ হাজার কর্মচারীকে, সান মাইক্রোসিস্টেম নতুন করে ৬০০০ জনকে ছাঁটাই করার কথা ঘোষণা করেছে। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিক্রেতা সংস্থা 'সার্কিট সিটি' শুধু তার ১৫৫টি দোকান বন্ধ করে দিয়েছে তাই নয়, তাকে 'দেউলিয়া' ঘোষণা করার জন্য আবেদনও জানিয়েছে। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম 'মল' অপারেটর 'জেনারেল গ্রোথ প্রপার্টিস', ৪৪টি রাজ্যে ২০০টি শপিং মল চালায়। সেটিও আজ 'দেউলিয়া' ঘোষিত হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

একইরকম দুরবস্থা আরও অনেক বৃহৎ সংস্থার। বিশ্বের বৃহত্তম মাইক্রোচিপ নির্মাতা 'ইন্টেল'-এর আয় ব্যাপক পরিমাণে কমে গেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম নির্মাণ শিল্পের উপকরণ নির্মাতা সংস্থা 'ক্যাটারপিলার' তার ব্যবসার আয়তন ছোট করে ফেলার পরিকল্পনা করছে। বৃহদায়তন বহুজাতিক সংস্থা 'জিই'-রও পরিকল্পনা রয়েছে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলার।

মোটর শিল্পের অবস্থাও খুব সঙ্গিন। ক্রমাগত বিক্রি কমছে এবং ছাঁটাই বাড়ছে। জেনারেল মোটর্স-এর মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থাও সম্প্রতি নিজেদের দেউলিয়া হয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। সেখানকার শ্রমিক সংগঠন ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স-এর সঙ্গে আগেকার চুক্তিগুলি আর্থিক দুরবস্থার দোহাই দিয়ে কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে চাইছে এবং আগে শ্রমিকদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, সেগুলিও খর্ব করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই তারা কোম্পানির ১ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদের কর্মীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল করেছে।

আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, এশিয়া সহ সর্বত্রই অর্থনীতির অবস্থা সঙ্গিন। ইউরোপের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি জার্মানি, বিশ্বের প্রধান ধনী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সেই জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা আজ যা দাঁড়িয়েছে, গত ৮০ বছরে কখনও তা দেখা যায়নি। রপ্তানির পরিমাণ বিপুলভাবে কমে যাওয়ায় সেখানকার বৈদেশিক বাণিজ্য মার খাচ্ছে। বাস্তবে জার্মানি এখন মন্দার কবলে চলে গেছে। সেখানকার অর্থদপ্তরের এক মন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ''আমরা খুবই কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি।'' এদিকে ব্রিটেনে অক্টোবরেই বেকারির হার গত পাঁচ বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। এর ওপর বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দায় বাজারে কোনওমতে টিকে থাকার প্রয়োজনে সেখানকার বহু সংস্থা কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে যাচ্ছে। ব্রিটেনের প্রধানতম টেলিকম সংস্থা ব্রিটিশ টেলিকম (বিটি) ঘোষণা করেছে যে, আগামী মার্চের মধ্যে তারা ১০ হাজার কর্মী সঙ্কোচন করতে চলেছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এশিয়ার জাপান, গত ছ'মাস ধরে আর্থিক মন্দার কবলে পড়ে রয়েছে। জাপানি বহুজাতিক সংস্থা 'সোনি' ইতিমধ্যেই ৮ হাজার স্থায়ী কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এশীয় সংস্থাগুলির মধ্যে এখনও পর্যন্ত এটিই বৃহত্তম ছাঁটাই। চীনেও শিল্পোৎপাদনের হার গত সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছেছে। ব্যাপক হারে ছাঁটাই চলছে চীনে। ভারতেও ছাঁটাই চলছে ব্যাপকভাবে এবং নিশ্চুপে। বণিকসভা ফিকির এক সমীক্ষায় বলেছে যে, আগামী কয়েক মাসে উৎপাদন শিল্পে উৎপাদন কমবে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত এবং কর্মী ছাঁটাই হবে ৩০ শতাংশের মতো। ইতিমধ্যেই উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধির হার গত বছরের ১০.১ শতাংশ থেকে কমে ৫.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার শেয়ার বাজারের হালও যথেষ্ট খারাপ। ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক জগতেই আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। অর্থনীতির এই সংকট কমার বদলে আগামী দিনগুলিতে যে আরও বাড়বে, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের নানা মহল থেকেই সেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সংক্ষেপে 'ও ই সি ডি' জানিয়েছে, ২০০৯ সালে এর সদস্য ৩০টি উন্নত অর্থনীতির দেশের গড় জি ডি পি (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন) ০.৩ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানের অর্থনীতি এইভাবে একসঙ্গে মন্দার কবলে এর আগে কখনও পড়েনি। 'ও ই সি ডি'র সদস্য দেশগুলিকেও ১৯৭০-এর পর থেকে কখনই এভাবে একসঙ্গে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি।

আমেরিকায় 'সাবপ্রাইম' সংকটের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে এই বিপর্যয় ক্রমে সর্বব্যাপক হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিকে শত শত কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে এবং আরও নানারকমভাবে চেষ্টা চালিয়েও বিশ্বজোড়া এই ভয়ানক মন্দা থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছে না আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশগুলি।

বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এই প্রশ্নে আজ দিশাহারা। আসলে এ সংকট তো খোদ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মেরই।

নটরাজমূর্তি কমিটির সুপারিশ বাতিলের দাবি জানাল গ্রামীণ ডাকসেবক অ্যাসোসিয়েশন

অন্যান্য বিভাগের মতোই ডাক বিভাগে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে, কমছে অনুমোদিত পদের সংখ্যাও। যতটুকু এখনও আছে, তা পূরণ করা হবে অবিভাগীয় কর্মী, অর্থাৎ ইডি/জিডিএস বিভাগের কর্মীদের দিয়ে। অন্যদিকে ইডি ও জিডিএসদের জন্য বরাদ্দ কাজ নটরাজমূর্তি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তুলে দেওয়া হবে ঠিকা কর্মীদের হাতে। সামগ্রিকভাবে কর্মীসংখ্যা অনেক কমে যাবে। গোটা বিভাগটাই ভর্তি করা হবে অবিভাগীয় এবং ঠিকা কর্মী দিয়ে। শুধুমাত্র উচ্চপদে কয়েকজন আমলা, বিভাগীয় কর্মচারী হিসাবে থেকে যাবে — এমন দিন খুব দূরে নয়। এই পরিস্থিতিতে ইডি/জিডিএস কর্মীদের বিভাগীয়করণের আন্দোলন শুধুমাত্র তাদের আন্দোলন নয়, তা বিভাগীয় কর্মচারীদের বিভাগীয় হিসাবে টিকে থাকার আন্দোলনও বটে' ১১ ডিসেম্বর জেপিএ অনুমোদিত 'অল ইন্ডিয়া গ্রামীণ ডাকসেবক অ্যাসোসিয়েশন'এর উদ্যোগে কলকাতা যোগাযোগ ভবনের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে এ কথা বলেন, জে পি এ সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিন্‌হা। এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল নটরাজমূর্তি কমিটির শ্রমিকস্বার্থবিরোধী সুপারিশ বাতিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী গ্রামীণ ডাকসেবকদের বিভাগীয় কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি এবং ডাক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সহ ১২ দফা দাবিতে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেপিএ-র সাধারণ সম্পাদক এ কে মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন ইডি কর্মী স্বপন জানা।

যোগাযোগ মন্ত্রীর উদ্দেশে চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর মাধ্যমে প্রেরিত স্মারকলিপিটি পাঠ করেন ইডি কর্মচারী আন্দোলনের কর্মী শান্তিরাম দাস। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের সভাপতি নূরুল আলম-এর নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে দাবিগুলি জানিয়ে বিষয়গুলি চূড়ান্ত করার জন্য সরকারকে এ আই জি ডি এস এ সহ অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছে। সমাবেশে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেপিএ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহসভাপতি বিমল জানা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তড়িৎ অধিকারী,

জেপিএ পোস্টাল ইউনিটের নেতা জয়দেব কর্মকার ও বিপ্লব দত্ত এবং এ আই জি ডি এস এ-র বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, মৃন্ময় ভক্ত এবং দেবাশিস গাঙ্গুলী। রাজ্য সরকারি, আধা-সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আগামী ২২ জানুয়ারির ধর্মঘটের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আলুচাষি আন্দোলনের কিছু দাবি মানতে বাধ্য হল সরকার

আগামী জানুয়ারি মাসেই আলুর উপযুক্ত সহায়কমূল্য ঘোষণার দাবি

আলুচাষিদের হিমঘরের ভাড়ার জন্য ভরতুকি দেওয়ার ঘোষণা, গত বছরের কৃষি ঋণের সুদ মকুব করে ৫০ শতাংশ টাকা ৩ বছরের দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত করে এ বছর নতুন করে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা আলুচাষি আন্দোলনের নীতিগত জয় সূচনা করেছে। উল্লেখ্য দীর্ঘ ৫ মাস যাবৎ উপরোক্ত দাবিতে বিভিন্ন জেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আলুচাষিদের আন্দোলন চলছে।

আন্দোলনের ন্যায্য দাবিগুলি যথাসময়ে না মেনে এখন দেরিতে মেনে নেওয়ার মধ্যে সরকারের চালাকি এবং ব্যবসায়ী তোষণনীতি কাজ করছে। কারণ, ৫ মাস আগে যদি সরকার এই ভরতুকি ঘোষণা করত তাহলে বহু চাষি এই ভরতুকির টাকা পেত। কিন্তু সরকার হিমঘরের ভরতুকি ঘোষণা করেছে গত ১৪ নভেম্বর। ততদিনে বেশিরভাগ সাধারণ চাষি হিমঘর থেকে আলু বার করে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন হিমঘরে বেশিরভাগই বড় ব্যবসায়ী পাইকারদের আলু রয়েছে। এইভাবে তাদের পকেট ভরাবার ব্যবস্থা এর আগেও সরকার করেছে। গত আগস্ট মাসে অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানি পরিবহনে কুইন্ট্যাল পিছু ২০ টাকা ভরতুকি দিয়ে। এই টাকাও গেছে অসৎ ব্যবসায়ীদের পকেটে। অনেকে ভুয়ো রসিদ দেখিয়ে ভরতুকির টাকা আত্মসাৎ করেছে। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি' বলে যাঁরা চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছেন, এই হল তাঁদের আসল চেহারা। ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ এবং নতুন করে ঋণ পাওয়ার বিষয়েও সরকারের দেরিতে ঘোষণা এবং আরও দেরিতে তা কার্যকর করার ফলে আলুচাষিরা এখানেও বঞ্চিত হলেন। কারণ, আলুচাষ শুরু হয়ে গেছে।

ঘোষণা সত্ত্বেও চাষিরা কেন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছে না, সেই বিষয়ে ৬ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তকে সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর সার নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত অর্থমন্ত্রীকে কমিটির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, চাষিরা ঋণ পাবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

১০ ডিসেম্বর কৃষিমন্ত্রী নরেন দে'কে আগামী জানুয়ারি মাসেই আলুর উপযুক্ত সহায়ক মূল্য ঘোষণা এবং পঞ্চায়েত স্তর থেকে সরকারি উদ্যোগে চাষির কাছ থেকে সরাসরি আলু কেনা সহ ৭ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি শঙ্কর ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী সহ প্রতিনিধিদল কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের দাবিতে সোচ্চার গড়িয়া নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত গড়িয়ার ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা স্থায়ী সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, রাস্তাঘাটের পরিপূর্ণ সংস্কার, বাড়ি বাড়ি পোস্টাল নম্বর, মশা-মাছি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য পুর পরিষেবার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। গড়ে তুলেছেন আন্দোলনের হাতিয়ার 'নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ'। মঞ্চের উদ্যোগে এলাকায় স্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা, পোস্টারিং, দেওয়াল লিখন প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের চাপে সিপিএম পরিচালিত পুরসভা কিছু কিছু রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা বা সামান্য কিছু ব্লিচিং পাউডার ছড়ালেও আন্দোলনের মূল দাবিগুলি অপূরিত থেকে গেছে। ২২ নভেম্বর মঞ্চের নেতৃত্বে এলাকার মানুষকে নিয়ে পুরসভায় একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুর প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দাবিগুলি সমাধানে উদ্যোগ না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে মঞ্চের সম্পাদক সন্দীপন মহাপাত্র জানিয়েছেন।

জয়নগরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকারের আই সি ডি এস প্রকল্প দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেও বন্ধ হওয়ার মুখে। কয়েক মাস ধরে জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রে খাদ্যসরবরাহ হয় বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা অত্যন্ত নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। খাবার তৈরির কোনও নির্দিষ্ট স্থান নেই। জ্বালানির বর্ধিত খরচ সরকার দিচ্ছে না। শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রকল্পকে ঘিরে চলছে চরম দুর্নীতি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের মতো দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও অত্যন্ত কম ভাতা পান। সম্প্রতি আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ভাতা যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ২০০ টাকা বৃদ্ধি করেছে। অথচ এই জেলার কোনও ব্লকেই এই বর্ধিত ভাতা দেওয়া হচ্ছে না।

এর প্রতিবাদে ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর এবং ২৬ নভেম্বর যথাক্রমে জয়নগর ১নং ও ২নং বিডিও এবং সিডিপিও-র কাছে ১৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। যথাক্রমে চার শতাধিক এবং দুই শতাধিক কর্মী ও সহায়িকা এতে সামিল হন। ডেপুটেশন দুটিতে নেতৃত্ব দেন ও বক্তব্য রাখেন তপতী ভট্টাচার্য, সুফিয়া বেগম, শঙ্করী সরদার ও প্রতিমা কামার এবং মাধবী পণ্ডিত, শকুন্তলা বড়ুয়া, রীনা নস্কর, কল্পনা মিস্ত্রী, লক্ষ্মীরানি কয়াল, অনিমা কান্ডারী প্রমুখ। আধিকারিকরা ১৫ দিনের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করার এবং দু'মাসের মধ্যে অন্য দাবিগুলি সুরাহার প্রতিশ্রুতি দেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

ডি এস ও-র উদ্যোগে
উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা কনভেনশন

ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশের প্রকৃত চেহারা যত প্রকাশিত হচ্ছে, দেশের উদ্বিগ্ন শিক্ষানুরাগী মানুষ ততই এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে নিয়ে ৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও।

কনভেনশনের শুরুতে মুম্বই ও অসমে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ও বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণে একটি প্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালন করা হয়। কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস। সমর্থনে সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম বলেন, ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশ হল শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবসায়ীকরণের এক পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এর সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই।

অসমের অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি বলেন, শিক্ষাকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার শাসকশ্রেণীর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষের যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি তখন সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ জাতিবাদ এই কাজটিকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। লিংডো কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়াকে বাধাহীনভাবে রূপায়িত করার জন্য এটা শাসকশ্রেণীর একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। সিকিমের হিউম্যান রাইটস্ ল নেটওয়ার্ক-এর ডিরেক্টর ডঃ ডোমা টি ভুটিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও অন্য কয়েকটি মামলার রায় উল্লেখ করে দেখান কীভাবে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর দেখান, শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের জন্য ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার যে নীল নক্সা রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে রচিত হয়েছিল তাকেই পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল কলেজ কমিশন।

কনভেনশনের সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত রায় ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই, অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড জিতেন চালিহা, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বাবুল বণিক, সিকিম রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কমরেড হেমন্ত ডাওয়ারি ও সম্পাদক কমরেড রমেশ শর্মা ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ন্যাশনাল নলেজ কমিশন ও লিংডো কমিশনের সর্বনাশা সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ, ছাত্রসভা, পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার এবং রাষ্ট্রপতির কাছে দাবিপত্র পেশ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

লক্ষ কোটি টাকা ভেট দিচ্ছে সরকার

তিনের পাতার পর

এ দেশেও সরকার এখন ঢালাও ঋণে উৎসাহ দিচ্ছে, অথচ দেশজুড়ে শিল্পোৎপাদন ক্রমাগত কমে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত অক্টোবরের শিল্পোৎপাদন সূচক অনুযায়ী, উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি আগের বছরের এই সময়ের ১৩.৮ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে শূন্যেরও ১.২ শতাংশ নীচে। এই পরিস্থিতিতে যখন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথায় ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে, তখন সরকারের এই ঋণনীতি আদৌ সফল হবে কি?

সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের স্থায়ী ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোকে গুরুত্ব দেয়নি। অভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াবার ব্যর্থতার জন্য রপ্তানি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষকদের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিবর্তে রপ্তানিযোগ্য অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে। ফলে আজ যখন আমেরিকা-ইউরোপ জুড়ে মন্দার কারণে রপ্তানিতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, অমনি অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বাস্তবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যা করা দরকার, আজ আর কোনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই করতে পারে না। যদি তা করতে পারত, তবে গোটা দেশটা এভাবে লোভী মালিকদের লুঠের বাজারে পরিণত হত না। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলি থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিয়ে সেগুলিকে মালিকদের অবাধ মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত হতে দিত না। সরকার বিপুল পরিমাণ টাকা আজ নানা খাতে মালিকদের ভরতুকি দিচ্ছে, তার একাংশ দিয়েও গণবন্টন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখা যেত। কিন্তু তার কোনওটাই সরকার করছে না।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকারের কাজই হল শোষণমূলক মালিকী ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। ভারতেও আক্ষরিক অর্থেই তা করা হচ্ছে। যার ফল হিসাবে গ্লাবনের মতো ধেয়ে আসছে ছাঁটাই এবং মূল্যবৃদ্ধির ঢেউ। এই পরিস্থিতিতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে প্রতিরোধ আন্দোলনকে। এ ছাড়া শোষিত মানুষের বাঁচার আর কোনও রাস্তা নেই।

সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে বেহালায় পথঅবরোধ, লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

১১ ডিসেম্বর গভীর রাতে কলকাতার বেহালায় পথদুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের উপর পুলিশ নির্মম হামলা চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই, প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস, টি এম সি এবং পি ডি এস যৌথভাবে ডায়মন্ডহারবার রোড অবরোধ করে। পুলিশের অসংখ্য দুষ্কর্মে ক্ষিপ্ত বাসযাত্রী ও পথচারীরাও অবরোধ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

আন্দোলনের প্রতি প্রবল জনসমর্থন দেখে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। পুলিশের অত্যাচারে গুরুতরভাবে আহত একজন অবরোধকারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, আর একজন চিত্রসাংবাদিককে মেরে পুলিশ পা ভেঙে দেয়। তারপরও বেহালা থানার পুলিশ, এমনকী ডি এস পি টাউনও এফ আই আর নিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে পুলিশ সুপার এলে বেহালা থানা চিত্র সাংবাদিকদের এফ আই আর গ্রহণ করে। অবরোধ ভেঙে দিয়ে পুলিশ নেতা-কর্মী সহ প্রায় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে ছিলেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য পূর্ব বেহালার আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড অমিতা ব্যানার্জী, কমরেড মিহির ঘোষরায় সহ অন্যান্য কর্মী এবং প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগণার সভানেত্রী স্বাতী মুখার্জী, বাদল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফল করুন
১৬-১৮ জানুয়ারি ২০০৯, বেইরুট, লেবানন

ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যোদ্ধা র‍্যামসে ক্লার্ক মানবাধিকার পুরস্কারে সম্মানিত

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংহতি কমিটির সভাপতি পূর্বতন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ককে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ বছর মানবাধিকার পুরস্কার (ইউ এন হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড-২০০৮) দিয়েছে। বস্তুত, বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে র‍্যামসে ক্লার্ক উজ্জ্বলতম নাম। তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ বেশি আনন্দিত হবে এই কারণে যে, ২০০৭ সালে কলকাতার সম্মেলন থেকে গঠিত যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটি আজ বিশ্বের দেশে দেশে সংগ্রামী জনগণের প্রবল সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার সভাপতির পদে আছেন র‍্যামসে ক্লার্ক। এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী এজন্য র‍্যামসে ক্লার্ককে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভিয়েতনামে মার্কিন যুদ্ধবাজ নীতির প্রতিবাদে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধবিরোধী ও মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যুগোস্লাভিয়ায় মার্কিন ধ্বংসলীলার তথ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি যুগোস্লাভিয়া যান এবং সংগৃহীত তথ্য প্রচারের দ্বারা মার্কিন সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত গণআদালত নিউ ইয়র্ক শহরে আইনি পদ্ধতি মেনে শুনানির মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে। সেই গণআদালতে ভারত থেকে কমরেড মানিক মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ইরাকের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচারের নামে প্রহসনের স্বরূপ উদঘাটিত করার জন্য র‍্যামসে স্বয়ং ইরাকে গিয়ে সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে আইনজীবীর দায়িত্ব নেন। কিন্তু মার্কিন পুতুল আদালত তাঁকে বিচারসভা থেকে বের করে দেয়। ২০০৭ সালে ভারতে এসে তিনি আক্রান্ত নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং নন্দীগ্রামের সংগ্রামের বার্তা বিশ্বে প্রচার করেছেন। আমেরিকার বুকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার'-এর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

পুরস্কার প্রাপ্তির পর এক অভিভাষণে তিনি যুদ্ধকে মানবাধিকারের ঘৃণ্যতম শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে মার্কিন সরকারের রবার স্ট্যাম্প না হয়ে শান্তিরক্ষায় নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণের কর্তব্য তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যথারীতি ভারতের বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যম র‍্যামসে ক্লার্কের বক্তব্য দূরের কথা, তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদও ছাপেনি।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সারা ভারত ডি এস ও'র ধারাবাহিক জয় ঃ (১) পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজ, (২) কলকাতায় যোগমায়াদেবী গার্লস কলেজ ও (৩) মুরলীধর গার্লস কলেজ এবং (৪) হুগলির শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in